তারিখ : 04 APR 2016
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

সমকাল

ইবিতে ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর সনদ লেখেন একজন!

■ সাইফুল ইসলাম রাজ, *ইবি*

তীব্র জনবল সংকটের কারণে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখায় হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করছে। অফিসের পিয়নদের দিয়ে দাপ্তরিক কাজ করানো হচ্ছে। অফিসে খাতা বাইন্ডিং করানোর কোনো লোক নেই। নেই কোনো গার্ড। তথ্য কেন্দ্র না থাকায় শিক্ষার্থীরা অফিসে এসে কোনো তথ্যই পাচ্ছেন না। এতে করে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি বিভাগের ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর সনদ লেখার জন্য মাত্র একজন লিপিকুশলী রয়েছেন। ফলে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার পর সপ্তাহখানেকের মধ্যে পরীক্ষার নম্বরপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা পেতে কয়েক মাস লাগছে।

ওই শাখার কর্মকর্তারা জানান, আগে আরিফুল হক ছাড়াও আবু তালিশ ও শহিদুল হক নামে আরও দুইজন লিপিকুশলী ছিলেন। সম্প্রতি পদোন্নতি পেয়ে আবু তালিশ শাখা কর্মকর্তা ও শহিদুল ইসলাম সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হয়েছেন। শহিদুল হক এখন নম্বরপত্র প্রদানের কাজ করেন। লিপিকুশলী আরিফুল হক সমকালকে বলেন, 'আমাকে দিনে কম করে হলেও ৫০-৬০টি সনদ হাতে লিখতে হয়। কোনো কোনো দিন এর চেয়ে বেশি লিখতে হয়। অনেক সময় সনদ লিখতে গিয়ে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যায়। তখন এটার সংশোধনও আমাকে করতে হয়। এর পাশাপাশি আমাকে আরও অতিরিক্ত কিছু কাজ করতে হয়। একা কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' শাখা কর্মকর্তা আবু তালিশ সমকালকে বলেন, 'পরীক্ষার ফল, সনদ, নম্বরপত্র ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান-সংক্রান্ত কাজগুলো কম্পিটারাইজড করা গেলে আমাদের এত কষ্ট করতে হতো না। কম্পিউটারের মাধ্যমে সব কিছু করা গেলে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ওঠাতে পারতেন।'

জানা গেছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখা থেকে সরাসরি একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ও সনদপত্রের কোনো প্রিন্ট কপি পাওয়া যায় না। শিক্ষার্থীরা জানান, ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস থেকে নম্বর তুলে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থিত কম্পিউটারের দোকানে থাকা একটি ফরম্যাটে বসিয়ে প্রিন্ট দিতে হয়। পরে তা স্বাক্ষরের জন্য অফিসে জমা দিতে হয়। এতে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, জরুরিভিত্তিতে দুই দিন এবং জরুরি বাদে সাত দিনের মধ্যে নম্বরপত্র ও সনদ দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তা অনেক সময় এক মাসেও দেওয়া হয় না। ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়ালিদ হোসেন মাস্টার্সের সনদ ও নম্বরপত্র উত্তোলনের জন্য গত ২৭ জানুয়ারি ব্যাংকে টাকা জমা দিয়েছেন। দুই মাস হতে চললেও এখনও তিনি তা ওঠাতে পারেননি। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এ কাজের দায়িত্বে আছেন সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শহিদুল ইসলাম। তাকে নিয়মিত অফিসে পাওয়া যায় না। অন্য কর্মকর্তাদের বিষয়েও একই অভিযোগ রয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী সমকালকে বলেন, 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখাকে ডিজিটাল করতে পারলে বর্তমানে যে জনশক্তি আছে তার অর্ধেকও লাগে না। আমি এই অফিসকে ডিজিটাল করার বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েছি। অদৃশ্য কারণে তা সম্ভব হয়নি।'

জানা গেছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখায় কোনো গার্ড নেই। পিয়ন মাত্র ৫ জন। শাখার উচ্চমান সহকারী পর্যায়ের এক কর্মচারী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পিয়নের অভাবে আমাদের অনেক সময় পিয়নের কাজ করতে হয়। অফিসের পিয়ন মুরাদ হোসেনকে একাই সনদ, নম্বরপত্র, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ডেলিভারি ও তাতে কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর করিয়ে নেওয়ার কাজ করতে হয়। পরীক্ষার জন্য উত্তরপত্র প্রস্তুত ও তাতে সিল মারার কাজ করেন মাত্র একজন। ইকরামুল হক নামের চতুর্থ শ্রেণীর ওই কর্মচারী সমকালকে বলেন, '২২টি বিভাগের পরীক্ষার উত্তরপত্র প্রস্তুতের কাজ আমাকে একা করতে হয়। মূল উত্তরপত্রে নয়টি ছাড়াও অতিরিক্ত উত্তরপত্রে সিল মারতে হয়। সে হিসাবে কোনো কোনো দিন এক থেকে দেড় হাজার উত্তরপত্রে ১০-১২ হাজার সিল মারতে হয়।'

জানা গেছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখায় ৪০ জন কর্মকর্তা আছেন। অথচ এর বিপরীতে কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। চতুর্থ শ্রেণী পদে সর্বশেষ ১৯৯২ সালে নিয়োগ হয়েছে। এর পর আর কোনো নিয়োগ হয়নি। ওই সময় যারা পিয়নসহ চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন তাদের অনেকে পদোন্নতি পাওয়ায় পিয়ন পদে কাজ করার লোক কমে গেছে। অনার্স চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের উত্তরপত্র দ্বিতীয়বার মূল্যায়নের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে পাঠানো হয়। এসব উত্তরপত্র পাঠানোর আগে কাপড় দিয়ে বাইন্ডিং করানো হয়। জানা গেছে, এ কাজের জন্য বর্তমানে কোনো লোক নেই। জিল্লু ও এনায়েতুল্লাহ আগে বাইন্ডিংয়ের কাজ করলেও পদোন্নতি পাওয়ায় তারা এখন আর বাইন্ডিংয়ের কাজ করেন না।

ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলী বলেন, 'নানা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখাকে ঢেলে সাজানো যাচ্ছে না। এ শাখায় একটি তথ্যকেন্দ্র থাকা দরকার। অথচ জায়গা সংকট ও জনবলের অভাবে তাও হচ্ছে না। তবে বিষয়টি নিয়ে ভাবছি। সাধ্য অনুযায়ী যতটুকু করার তা করব।'